মওলানা মোহাম্মদ আলীর রাষ্ট্রচিন্তা (১৮৭৮-১৯৩১)

সৈয়দ মকসুদ আলী*

ইং ১৮৭৮ সনে ভারতের রামপুর রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মওলানা মোহাম্মদ আলীর জন্ম। বাল্যকাল থেকে তিনি ইসলামী ঐতিহ্য প্রভাবিত পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও তাঁর ইংরেজী শিক্ষার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। আলীগড় কলেজ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বি. এ পাশ করেন। উল্লেখ্য যে তিনি বি.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। এরপর অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি ছিলেন আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুকাল রামপুর রাজ্যের প্রধান শিক্ষা অফিসাররূপে দায়িত্ব পালন করেন এবং শেষে বরোদা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু চাকুরিজীবীর জীবন অপেক্ষা সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা কমরেড ও উর্দু সাপ্তাহিক হামদর্দ ছিল তাঁর মতাদর্শ প্রচারের প্রধান মাধ্যম।

উপমহাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন মওলানা মোহাম্মদ আলী তাদের অন্যতম। ইংরেজ রাজশক্তির মত্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে তিনি ভারতীয়দের জন্য পূর্ণ স্বরাজ দাবি করেন। বস্তুত রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারনা শুরু হয় খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রনায়কের। তাঁর রাজনৈতিক অবদান আলোচনার পূর্বে খেলাফত আন্দোলনের ঈষৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উপমহাদেশের মুসলিম নেতাদের রাজনৈতিক ভাবধারা ও কর্মকান্ডে তাঁদের প্যান-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামকে তাঁরা দেখেছেন একটি বিশ্বজনীন আদর্শ ধর্ম হিসাবে। কাজেই বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী শক্তির

* রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুনরুজ্জীবন বা স্থিতিশীলতা রক্ষার ব্যাপারে তারা সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন। ১৯১৮ সনের জানুয়ারীতে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষনা করেন যে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় যদি মিত্রশক্তির পক্ষে অস্ত্রধারণ করে তাহলে যুদ্ধে জয়-লাভের পর মিত্রশক্তি তুরস্কের অখন্ডতা ও খিলাফতের উপর কোন-প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। লয়েড জর্জ-এর আশ্বাসের উপর আস্থা রেখে মুসলমানগণ দলে দলে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর বৃটেন ও মিত্রশক্তি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সেভার্স-এর সন্ধিচুক্তি ও জাতিসংঘের নির্দেশবলে মিত্রশক্তি (বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস) তুরস্কের বিরাট অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নেয়। একসময় যেসব অঞ্চল তুরস্কের অধীনে ছিল-যেমন, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ট্রান্সজোর্দান, মেসোপটেমিয়া, পালি-পলি, আদ্রিয়ানোপল, স্মার্না, তেনেদোস, এমব্রোস দ্বীপপুঞ্জ ও এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ইত্যাদি—তার উপর আধিপত্য বিস্তারের অধিকার লাভ করে বিভিন্ন মিত্রশক্তি। অবশ্য ভাগাভাগির সিংহভাগ লাভ করে বৃটেন। উপরন্তু তুরস্কের উপর বিপুল অংকের ক্ষতিপূরনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

বৃটেন তথা মিত্রশক্তি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যেভাবে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব হরণ করে তার ফলে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হন। এর প্রতিবাদে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁর ভ্রাতা মওলানা শওকত আলী এবং মওলানা আবুল কালাম আযাদ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৯ এর মধ্যভাগে তাঁরা নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে আলী ভ্রাতাদ্বয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র সমালোচনা করেন। এবং সে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সকল কাজে সহযোগিতা দানে বিরত থাকার জন্য সকল ভারতবাসীকে নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে খেলাফত আন্দোলনের সূত্রেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। এসময়ে খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহবান জানান। তাঁদের বিশেষত মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনলবর্ষী বক্তৃতা জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়, যার ফলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগদান করে। পূর্বের কোন আন্দোলনে ভারতীয় জনগণ এরূপ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিনা সন্দেহ। এবং একথা অনস্বীকার্য যে খেলাফত আন্দোলনই ভারতীয় জনগণের জন্য রাজ-

নীতিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। যে রাজনীতি উঁচু মহলে সীমাবদ্ধ ছিল তা জনগণের আয়ত্তাধীনে চলে আসে। ১৯১৯-এর ১৭ অক্টোবর খেলাফত দিবস পালন করা হয়। সেদিন যেরূপ ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তাতে বৃটিশ সরকার শংকিত হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও খেলাফত আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ততর হবে। তাছাড়া, কুখ্যাত রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ হত্যাকান্ড জনমানসে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও আগে থেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

অপরদিকে ইংরেজ সরকার খেলাফত আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। সরকার দন্ডবিধি আইন অনুযায়ী ১০৪ ও ১০৮ নং ধারা জারী করে, রাজদ্রোহমূলক সভাসমিতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীকে কারারুদ্ধ করে। তদুপরি নানাকানা সাহেবের গুরুদুয়ারায় গমনরত তীর্থযাত্রীদের উপর সরকারী বাহিনীর গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় দুইশত তীর্থযাত্রী মৃত্যুবরণ করে। এসব ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। হরতাল, বৃটিশ পণ্যসামগ্রী অগ্নিসংযোগ, বৃটিশ বিরোধী প্রচারনা ও সভাসমিতি ইত্যাদি তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমনকি ১৯২১-এর নভেম্বরে যেদিন প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে আসেন সেদিন হরতাল পালন করা হয় এবং বহু জায়গায় কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। খিলাফত আন্দোলন অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি; কারণ ১৯২৩-এর ১৭ নভেম্বরে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের আংগোরা বিধান সভা ও খলিফাশাসনের পতন ঘটিয়ে নিজেই শাসনক্ষমতা ধারণ করেন এবং সে সঙ্গে খলিফা ষষ্ঠ সুলতান মাহমুদকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করেন। তুরস্কে খলিফাশাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের খিলাফত আন্দোলনেও ভাটা পড়ে। তবে এই আন্দোলনের গতি থেমে গেলেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এর বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য।

যে রাজনৈতিক পশ্চাদভূমিতে মওলানা মোহাম্মদ আলীর রাজ-

নৈতিক চিন্তা দানা বাঁধে তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া গেল। তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, ইসলামী ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা উভয়ই তাঁর চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি য়ুরোপীয় জাতিবাদের বিকাশধারাও লক্ষ্য করেন। একদিকে ইসলামের আদর্শ এবং অপরদিকে য়ুরোপের জাতিবাদ তাঁর চিন্তাধারার মূলে ভিত্তি। তাঁর উক্তি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ যেখানে আল্লাহ আদেশ করেন আমি আগে একজন মুসলমান এবং পরেও মুসলমান এবং শেষেও মুসলমান এবং মুসলমান বৈ তার কিছু নই...কিন্তু যেখানে ভারতের প্রশ্ন আসে আমি আগে একজন ভারতীয়, পরেও ভারতীয় এবং শেষেও ভারতীয় এবং ভারতীয় বৈ আর কিছু নই।[১] (অনূদিত)

মওলানা মোহাম্মদ আলীর চিন্তা ও চেতনার মূলে উৎস ইসলাম ধর্ম, এ কারণে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাজনীতির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি বলেনঃ "রাজনীতিকে ধর্মের আওতামুক্ত করার চিন্তাটাই ধর্মের অর্থ গোঁড়া মতবাদ নয়; আচার-অনুষ্ঠানও নয়; আমি মনে করি এর অর্থ জীবনবিশ্লেষণ। আমার কৃষ্টি আছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আছে—এর সামগ্রীক সংশ্লেষণই ইসলাম।"[২]

ইসলাম ধর্মে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল বলেই অনেক সময় আঞ্চলিক জাতিবাদের পরিবর্তে ধর্ম-ভিত্তিক জাতিবাদকে তিনি প্রাধান্য দেন। বস্তুতঃ বিশ্বের সকল মুসলমানকে তিনি দেখেন একটি ধর্মীয় জাতি হিসাবে। এই প্যান-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই তিনি আধুনিক জাতিবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেনঃ "আমরা জাতীয়তাবাদী নই, বরং অতিজাতীয়তাবাদী (সুপার ন্যাশনালিস্ট) এবং একজন মুসলমান হিসাবে আমি বলছি যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শয়তান তৈরি করেছেন জাতি। জাতি বিভক্ত করে, আমাদের ধর্ম ঐক্যবদ্ধ করে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে বিরাট ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতা দেখা গেছে কোন ধর্মযুদ্ধে সেরূপ দেখা যায়নি, এবং সে যুদ্ধটা ছিল তোমাদের (ইংরেজ) জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ, আমাদের জেহাদ নয়।"[৩]

মওলানা মোহাম্মদ আলী তৎকালীন ভারতের ভবিষ্যত সংকার পদ্ধতির যে রূপরেখা তৈরি করেন তাতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের তখনকার প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। তিনি মনে করেন, 'দোকানদারের জাত' ইংরেজ শাসকেরাই এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে; এবং 'হিন্দু ও মুসলমানগণ যে কারণে আজ পরস্পর ঝগড়া করছে তা হল,

ইংরেজের আধিপত্য তারা আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে রাজী নয়।"[৪] হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আলোকে তিনি যে সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তা থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তাঁর অতন্দ্র সজাগতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মেজরিটি রুল' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ভারতের জন্য আদর্শ শাসনব্যবস্থা একথা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন,[৫] তবে তিনি-এও বলেন যে শাস তন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেহেতু 'মেজরিটি রুল-এর' ঐতিহ্য বলে কিছু নেই—রাম, পান্ড, কর, সুলতান মাহমুদ, আকবর, আওরংজেব, ওয়ারেন হেস্টিংস, ক্লাইভ এবং এমনকি লর্ড আরউইনের আমলেও এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না—কাজেই তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকার রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ই সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করবে। ভারতের লোক সংখ্যার ৬৬ ভাগ হিন্দু, ২৫ ভাগ মুসলমান এবং বাকী ৯ ভাগের মধ্যে রয়েছে খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় বৃহত্তম বলে তার রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি দাবি করেন। তিনি বলেন: "A separate electorate gives to the Mussalman client in the case he is fighting the counsel that he selects himself and can trust."[৬]

প্রায় এক যুগ পরে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রশ্নে মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তাঁর ধারণা জন্মে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পথে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান হবে না, এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থেও এ পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে না। এর পরিবর্তে তিনি মিশ্র আঞ্চলিক নির্বাচনব্যবস্থার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হবে তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন: আসনগুলি দুইটি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; এবং সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে যদি সে,

এক. তার নিজ সম্প্রদায়ের মোট প্রদত্ত ভাগের ৪০ ভাগ ভোট পায় এবং

দুই. যে এলাকায় ঐ প্রার্থীর সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ বা তার কম সে এলাকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট প্রদত্ত ভোটের অন্যূন ৫ ভাগ ভোট পায় এবং

তিন. যে এলাকায় ঐ প্রার্থীর সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার দশভাগের বেশী অথবা তার সম্প্রদায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয় সেক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট প্রদত্ত ভোটের অন্যূন দশ ভাগ ভোট পায়।[৭]

তবে কোন এলাকার প্রার্থী যদি এর কোন একটি ন্যূনতম শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে যে প্রার্থী তার সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে তাকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করতে হবে। মওলানা মোহাম্মদ আলী মনে করেন যে এই নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা নিশ্চিহ্ন হবে এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটবে।

ভারতের ভবিষ্যত সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপের বিশেষত ইংলন্ডের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। ভারতীয় ভূখন্ডের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এদেশের জন্য তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এবং বহুরাজ্য অধ্যুষিত ভারতের জন্য এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র প্রযোজ্য নয় একথাও তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল তাই নয়, আগামী দিনের স্বাধীন ভারতকে ইউনাইটেড স্টেটস্ অব ইন্ডিয়া নামে অভিহিত করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলী স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন প্রকাশ আপোস করেন নি। পরাধীনতা মানুষকে শুধু দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে না, তার মনুষ্যত্বও বিনষ্ট করে একথা তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কাজেই স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কোন প্রকার মধ্যপন্থা অনুসরণের কথা চিন্তা করেন নি। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি দৃপ্তকন্ঠে বলেন: "I have not come to ask for Dominion status—The one thing to which I am committed is complete independence."[৮] এবং পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনবোধে গোটা মুসলিম ভারত তাঁর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হবে একথাও ঘোষনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন সহযোগিতাবাদী নেতৃত্বের সূচনা করেন সে সময়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। তাঁর প্রধান লক্ষ্য

ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, ইংরেজশাসিত ভারতে শাসনব্যবস্থার চরিত্র কিরূপ হবে সেটা তাঁর কাছে প্রধান সমস্যারূপে দেখা দেয়নি। তিনি মনে করেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণই এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। স্বতন্ত্র নির্বাচন বা সংখ্যানুসারের ভিত্তিতে বিধানসভায় আসন লাভের প্রশ্নে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান ভারতীয় জনগণ নিজেরাই করবে। এজন্য তিনি ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ হওয়া সম্মানজনক মনে করেন নি।

মওলানা মোহাম্মদ আলী 'স্বাধীনতা হীনতায়' বাঁচতে চাননি বলেই ইংলন্ডে থাকাকালে বলেছিলেন যে পরাধীন ভারতে তিনি আর ফিরে যাবেন না। তিনি কথা রেখেছিলেন। ইং ১৯৩১ সনে ইংলন্ডেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে, মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যে অবদান রেখেছেন তার গুরুত্ব কোন ক্রমে খাটো করে দেখা চলে না। সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধবাদ ধারা কিছুকালের জন্য স্তিমিত ছিল মওলানা মোহাম্মদ আলী পুনরায় তাতে প্রবল গতিবেগ সৃষ্টি করেন। তাঁর অপর অবদান এই যে তিনি খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে সম্পৃক্ত করেন। বস্তুতঃ খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় পটভূমিকায় প্রসারিত হয়।

তবে তিনি যে খেলাফতের আদর্শ সম্মুখে রেখে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন তা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি কি খলিফাতন্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন? অন্ততঃ তাঁর রচনাবলী ও বক্তৃতা বিবৃতি এরূপ প্রমাণ বহন করে না। ভারতে খেলাফত পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন একথা মেনে নেওয়া শক্ত, বরং একথা সত্য যে ইসলামী আদর্শের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই পৃথিবীর সকল ইসলামী শক্তির স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। কাজেই যখনি বিশ্বের যে স্থানে ইসলামী শক্তির উপর অমুসলিম শক্তির আঘাত এসেছে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই বিক্ষোভ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম প্রধান উৎস।

এরপর তাঁর জাতিবাদের কথা ধরা যাক। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস হেতু স্বাভাবিকভাবেই সমগ্রবিশ্বের মুসলিম সমাজের সংগে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছেন। এ কারণে বিশ্বের মুসলমান-

গণকে তিনি একই ধর্মীয় জাতিভুক্ত মনে করেছেন। অর্থাৎ, যেখানে মুসলিম বিশ্বের প্রশ্ন জড়িত সেখানে আঞ্চলিক জাতিবাদ তাঁর চিন্তাধারায় প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু ভারতের প্রশ্ন যখন এসেছে তিনি সর্বভারতীয় জাতিবাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। এর কারণ তাঁর স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ। বস্তুতঃ তাঁর প্যান-ইসলামী অতিজাতিবাদ ও স্বদেশভিত্তিক আঞ্চলিক জাতিবাদ তাঁর চিন্তাধারায় কোন বৈপরীত্য সৃষ্টি করে নি। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় ইসলাম, স্বদেশ ও স্বাধীনতা সমান গুরুত্ব পেয়েছে। এ কারণে তিনি রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। অনস্বীকার্য যে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তিনি সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন; কিন্তু তাই বলে তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতা বলা যুক্তিসংগত নয়। তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজ যেভাবে সর্বক্ষেত্রে অবহেলার শিকারে পরিণত হয়েছিল একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে তিনি সে অবস্থাটা মেনে নিতে পারেন নি। এ কারণে যখনি তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন একইসংগে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হয়তো একথা অত্যুক্তি নয় যে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ধারায় তিনি যে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা আন্দোলনও জোরদার হয়েছিল। এদিকে থেকে মওলানা মোহাম্মদ আলীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পাদটীকা

১. Round Table Conference Proceedings, 1930-31, p. 96.
২. ঐ পৃ: ৯৬
৩. ঐ পৃঃ ৯৬
৪. RTC-P, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫
৫. গোলটেবিল বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৬৩
৬. ঐ পৃঃ ১৬৩
৭. RTC-P, পৃঃ ১৬৬-৬৭
৮. RTC-P, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩

গ্রন্থপঞ্জী

Proceedings of the Indian Round Table Conference, 1930-31

W. C. Smith, *Modern Islam in India : A Social Analysis* (London, 1946)

Ram Gopal, *Indian Muslim : A Political History* (Bombay, 1959)

Syed Murtuza Ali, *Personality Profiles* (Dacca, 1965)

A. C. Banerjee, *Two Nations* (New Delhi, 1980)

B. K. Ahluwalia and Shashi Ahluwalia, *Muslims and India's Freedom Movement* (New Delhi, 1985)

G. B. Mathur, *Growth of Muslim Politics in India* (Delhi, 1979)